বিলেতের বাংলা পত্রিকা

ফিরোজ মাহবুব কামাল

একটি জনগোষ্ঠি কতটা জীবন্ত, কতটা উন্নত বা কতটা সৃষ্টিশীল সেটির সবচেয়ে নির্ভূল পরিচয় ফুটে উঠে সে জনগোষ্ঠির মিডিয়া বা পত্রিকায়। বাজারের থলির দিকে তাকিয়েই বলা যায় সে পরিবারের লোকেরা কি খায় এবং কি তাদের রুচি। থলিতে কেনা সামগ্রীর মান ও পরিমাণ দেখেই বুঝা যায় সে পরিবারের সদস্যদের শারীরিক সুস্থ্যতার মান। তেমনি একটি জনগোষ্ঠির মানসিক চাহিদা ও পুষ্টির পরিচয় মেলে তারা কি পড়ে বা সে এলাকার পত্রিকার কি ছাপা হয় সেটি দেখে। একটি জাতির শিক্ষা, সংস্কৃতি ও দর্শনের প্রতিবিম্ব হলো এটি। সমাজের সাধারণ মানুষেরা যা চায়, শিক্ষিত জনেরা যা ভাবে বা রাজনৈতিক ও সমাজকর্মীদের যা এজেন্ডা সেটিই ফুঠে উঠে মিডিয়ায়। তাই একই সমাজে বা একই দেশে বাস করেও দুটি ভিন্ন ধারার ও ভিন্নমানের জনগোষ্টির মিডিয়ার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মান কখনই এক হয় না। কারণ তাদের মানসিক গঠনই এক নয়। শুধু প্রকাশিত খবর, সম্পাদকীয় বা নিবন্ধগুলিতেই নয়, সে পার্থক্য ধরা পরে এমনকি পত্রিকার বিজ্ঞাপণেও। ফলে বোধগম্য কারণেই সে পার্থক্যগুলী অতিশয় প্রকট বিলেতের বাংলা পত্রিকাগুলি ও এদেশের ইংরেজী পত্রিকার মাঝে। পত্রিকা একটি সমাজের অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এটি ছাড়া একটি আধুনিক সমাজকে সামনে এগিয়ে নেওয়া অসম্ভব। সম্ভব নয় সাধারণ মানুষের চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন সাধন। মিডিয়া শুধু খবরই পরিবেশন করে না, বরং খবরের পিছনে যে প্রেক্ষাপট থাকে সেটির বিশ্লেষণও করে। সমাজের অনেক অপ্রকাশিত বিষয়কে সামনে নিয়ে আসে। সমাজের সমস্যাগুলো কি, সমাধানই বা কি - সেগুলো সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরে। এ নিয়ে মানুষকে আন্দোলিত করে, সংঘবদ্ধ করে এবং সেগুলিকে রাজনৈতিক ও সামাজিক এজেন্ডায় পরিণত করে। তাই যে সমাজে পত্রিকা নেই সে সমাজে সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে আন্দোলন নেই, রাজনৈতিক পরিবর্তনও নেই। একারণেই মিডিয়াহীন প্রাচীন সমাজে শত শত বছরের স্বৈরাচারি বর্বর রাজতন্ত্রও সম্ভব হয়েছে। বস্তুতঃ বিগত পঞ্চাশ বছরে জ্ঞানবিজ্ঞানে যে বিপ্লব এসেছে তা মানব ইতিহাসের বাকি বহু হাজার বছরেও হয়নি। এর কারণ পত্র-পত্রিকা বা মিডিয়া। মিডিয়া বা পত্রিকা শিক্ষাকে বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ থেকে ঘরের দুয়ারে নিয়ে গেছে।

ইংল্যান্ড বিশ্বের অন্যতম দেশ যেখানে মিডিয়া প্রচন্ড শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ। প্রধানমন্ত্রী, প্রশাসনের কর্মকর্তা, এমনকি রাণীও মিডিয়াকে সমীহ করে চলে। দুনিয়াখ্যাত বহু পত্রিকা ছাপা হয় লন্ডন থেকে। সার্কুলেশনও প্রচুর। কোন কোন পত্রিকার প্রচার সংখ্যা বাংলাদেশের সমুদয় পত্রিকার প্রচার সংখ্যার চেয়েও অধিক। কোন আইন পার্লামেন্টে যাওয়ার আগেই তা নিয়ে এসব পত্রিকায় এ্যাকাডেমিক আলোচনা শুরু করেন দেশের নামীদামী কলামিষ্টরা। তাদের আলোচনা পার্লামেন্টের বিতর্কের চেয়েও সমৃদ্ধ। শুধু মন্ত্রী বা এমপিগণই নন, দেশের প্রশাসনিক কর্মকর্তা এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরাও প্রচুর শিক্ষালাভ করেন এসব কলামিস্টেদের লেখা থেকে। বিলেতের বিত্ত-বৈভব ও বিশ্বব্যাপী প্রভাবের বড় উৎস্য জ্ঞানার্জনের এ বিরামহীন পদ্ধতি। যারা এ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত তারা শুধু নিজ দেশেই উপরে উঠছে না, বিশ্বের মাঝেও মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে। তাদের শিক্ষাগত মান, গবেষণার সামর্থ ও ভাষাগত বুৎপত্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকশ প্রফেসরদের চেয়ে কম নয়। বহু পত্রিকা কাজ করছে শত বছরেরও বেশীকাল ধরে। যত বিজ্ঞ আলোচনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরগণ শ্রেণীকক্ষে শুনায় এরা শুনিয়ে থাকেন তার চেয়ে অধিক এবং প্রতিদিন। ছাত্রদের সংখ্যাও কোটি কোটি। প্রবীণ প্রফেসর, ক্ষমতাশীল রাজনীতিবিদ ও বিজ্ঞ বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে আম জনতা - সবাই তাদের ছাত্র। তাদের কারণে দেশব্যাপী গড়ে উঠেছে জ্ঞানবিতরণের নেটওয়ার্ক। ফলে সমগ্র দেশ পরিণত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। এতে সমৃদ্ধি এসেছে জ্ঞানের ভূবনে, বাড়ছে জনগণের সৃষ্টিশীল সামর্থ। ফলে দ্রুত বাড়ছে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি। আয়োতনে ও জনসংখ্যায় ক্ষুদ্র হয়েও বৃটেন বিশ্বব্যাপী যে সাম্রাজ্য সৃষ্টি করেছিল তার বড় কারণ তো ছিল জ্ঞানার্জনের এ প্রক্রিয়া। জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান বিতরণকে এভাবে গণমুখি না করে উন্নত সমাজ নির্মাণের কথা ভাবাই যায় না। ইসলামের প্রাথমিক যুগে একাজটিই ব্যাপকতর হয়েছিল। হত্যাযোগ্য যুদ্ধবন্দীকে নবীজী (সাঃ) শুধু এজন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন যে সে নিরক্ষর মুসলমানকে অক্ষরজ্ঞান দিয়েছিল। অথচ একখানি ভাল পত্রিকাতো অক্ষরজ্ঞান দেয় না, দেয় গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান। ফলে একজন সমঝদার ব্যক্তির কাছে পত্রিকাপাঠ ততটুকুই গুরুত্ব দিয়ে থাকে, যতটুকু গুরুত্ব পায় স্কুলের বিদ্যাশিক্ষা। এমন চেতনাতেই সমৃদ্ধ হয়েছে এদেশের সামাজিক পুঁজি তথা সোসাল ক্যাপিটাল যা বিপ্লব এনেছে তার অর্থনীতি, রাজনীতি ও সামরিক সামর্থে। অথচ বাংলাদেশসহ বহুদেশ সামনে এগুতে পারছে না এ সামাজিক পুঁজি না থাকাতে। ফলে শিল্পের স্থলে বাংলাদেশে বেড়েছে দূর্নীতি, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য। ইঁদুর যেমন ক্ষেতের ফসলে সর্বনাশ ডেকে আনে তেমনি দূর্নীতিপরায়ণ মানুষগুলোও সর্বনাশ ঘটায় দেশের সম্পদে। ভিক্ষার তলাহীন ঝুড়ি বা দূর্নীতিতে প্রথম হওয়ার যে খেতাব বাংলাদেশের কপালে জুটেছে সেটি বস্তুতঃ এসব ঈঁদুর-সূলভ এ দূর্বৃত্তদের কারণেই। এটি দেশের ভূগোল, প্রকৃতি বা জলবায়ুর কারণে নয়। আর এ দুরাবস্থাই সাক্ষ্য দেয় সামাজিক পুঁজি নির্মাণে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, মিডিয়া ও বুদ্ধিজীবী মহল কতটা ব্যর্থ। আর তেমনি ব্যর্থতা বিলেতের বাংলাদেশী কমিউনিটিতে। আর সে ব্যর্থতা প্রতিফলিত হচ্ছে লন্ডন থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকাগুলোতে।

ইংরেজদের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের মানুষ এ দেশে প্রচন্ড ভাবে লড়ছে। চাকুরি, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ প্রতি ক্ষেত্রে তাই প্রচন্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এ লড়াইয়ে সামনে এগুনো দূরে থাক, নীচে নামা থেকে বাঁচতে হলেও চাই যোগ্যতা। সেটি শুধু প্রফেশনাল স্কিল

নয়, বরং সোসাল স্কিল, লিডারশিপ স্কিলসহ আরো বহুবিধ স্কিল। চাই আত্মবিশ্বাস। চাই সমাজ, বিশ্ব ও পরিবেশ পরিচিতি। মিডিয়া সেটিই দেয়। এখানে বসবাসরত বাংলাভাষীদের বেশীর ভাগই ইংরেজিতে অদক্ষ। ফলে ইংরেজি পত্রিকা পাঠের সামর্থও তাদের সীমিত। তাছাড়া ইংরেজী মিডিয়া বাংলাদেশীদের মনের খোরাকও যথাযথ মেটাতে পারে না। কারণ, বাংলাভাষী পাঠকদের সমস্যা যেমন ভিন্ন, তেমনি ভিন্ন জীবনের মূল এজেন্ডা ও লক্ষ্য। শুধু এ দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা পেলেই তাদের চলে না, আখেরাতে সফল হওয়ার লক্ষ্যেও প্রচন্ড মনযোগী হতে হয়। বিলেতের বাংলাদেশী কমুউনিটির বিপর্যয় বস্তুতঃ উভয় দিক দিকেই। ড্রাগ, গ্যাং ফাইট, মাদক ব্যবসা, অশিক্ষা ও নানাবিধ সামজিক ব্যাধিতে মারাত্মক ভাবে আক্রান্ত এ কমিউনিটি। এসব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা, সমাধান খুঁজে বের করা এবং সেটি নিয়ে সর্বস্তরে সচেতনা সৃষ্টির দায়িত্ব সমাজের যারা জ্ঞানী ব্যক্তি তাদের। সমাজকে তারা জাগরিত ও আন্দোলিত করবে এবং পদে পদে দিকনির্দেশনা দিবে এটিই কাঙ্খিত। মিডিয়া তাদের চিন্তাকে ঘরে ঘরে পৌছে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, বিলেতের বাংলা পত্রিকাগুলো এক্ষেত্রে কতটুকু সফল? অর্ধ ডজনেরও বেশী বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হয় লন্ডন থেকে। এসব পত্রিকায় পাতায় কতটুকু গুরুত্ব পাচ্ছে এসব সামাজিক রোগ-ভোগ থেকে কমুউনিটির রোগমুক্তির ভাবনা। লক্ষণীয় যে, এনিয়ে চিন্তা ভাবনা করবে এমন লোকদের সংখ্যা বিলেতের বাংলাদেশীদের মাঝে বিরল। বরং মুষ্টিমেয় যে ক'জন লেখালেখি করেন তারাও এ নিয়ে প্রায় নিরব। অধিকাংশই ব্যস্ত বাংলাদেশের রাজনীতির স্মৃতিচারণ নিয়ে। নাই কোন এ্যাকাডেমিক মননশীলতা বা পান্ডিত্য। ফলে এসব লেখায় না উপকার হচ্ছে বাংলাদেশের, না এদেশের বাংলাভাষীদের। অপরদিকে বাংলা পত্রিকাগুলির প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ জুড়ে থাকে বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রিকা থেকে কাটিং-পেস্টিং করা নিবন্ধ বা খবর। এবং এগুলীর অধিকাংশই যেমন রাজনৈতিক, তেমনি কলহপূর্ণ। এগুলি বাংলাদেশের ঘটনাবলি নিয়ে অবহিত করলেও তাতে এখানকার বাংলাদেশী কমিউনিটির রোগমুক্তি ঘটছে না। এটি বিলেতে বসবাসকারি বাংলাদেশীদের বিশেষকরে পত্রিকার লেখক ও প্রকাশকদের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। তাদের মাঝে এ উপলদ্ধিও বিরল যে নিছক পাউন্ড কামাই করে এ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিপর্যয় রোধ করা যাবে না। রোধ হবে না প্রাত্যাহিক ভোজনের পরিমাণ বাড়িয়েও। কারণ এ রোগ শারীরিক অপুষ্টির নয়, নিতান্তই বুদ্ধিবৃত্তিক। এত প্রাচুর্যের মাঝে ড্রাগ, সন্ত্রাস, দূর্নীতি, মাদক ব্যবসা ও চারিত্রিক স্খলনের কারণ অর্থনৈতিক নয়, বরং চেতনার অপুষ্টি। এ অপুষ্টি পূরনে বৃটিশদের মাঝে বহু সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানই শুধু নয় কাজ করছে হাজার হাজার লেখক ও বুদ্ধিজীবী। অথচ এ ফ্রন্টে বাংলাদেশী লড়াকু সৈনিকের বড্ড অভাব।

এদেশে বসবাসরত বাংলাদেশীদের বুদ্ধিবৃত্তিক দৈন্যতা যে কত প্রকট সেটি এসব সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকাগূলীর পাতা খুললেই নজরে পড়ে। এদেশের বাংলাদেশী কমিউনিটি ডুবতে বসেছে এবং সেটি ভাবিয়ে তুলেছে এমনকি বৃটিশ হোম অফিসকেও। অথচ তা নিয়ে তেমন জোড়ালো বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণ নেই এসব পত্রিকায়। ফলে সহজেই বুঝা যায়, কমিউনিটির সমস্যা নিয়ে গভীর চিন্তা ভাবনা ও লেখালেখি করবে এমন লেখক বিলেতে খুব একটা গড়ে উঠেনি। আরো দুঃখজনক হলো, যে ভাবে অপরাধি চক্র এসব পত্রিকায় প্রশ্রয় পাচ্ছে সেটি। যে কোন কমুউনিটির ন্যায় বিলেতের বাংলাদেশীদের মাঝেও অপরাধি চক্র রয়েছে। এরা সমাজের জঘন্য কীট। কীট যেমন খাদ্য-ভান্ডারে হানা দিতে ছিদ্র তালাশ করে এরাও তেমনি মানুষের পকেটে হানা দেওয়ার সহজ পথ খোঁজে। কেউ খাজা বাবা, কেউ আজমেরি বাবা, কেউ বা যোগী-ঋষি সেজে সকল রোগভোগ ও পেরেশানীর শতভাগ আরগ্যের গ্যারান্টি দেয়। এমন অলৌকিক সামর্থের কথা জানিয়ে পত্রিকার পূর্ণ পৃষ্ঠা জুড়ে তারা বিজ্ঞাপণও দেয়। অথচ এমন গ্যারান্টি এদেশের কোন ডাক্তার বা হাসপাতাল দিতে পারে না। কোন মানুষই তা পারে না। কথা হলো এটি যে নিছক প্রতারণা সেটি বুঝবার সামর্থ কি এসব পত্রিকার সম্পাদকদের নেই? যে কোন সুস্থ্য পত্রিকার দায়িত্ব হলো, জনস্বার্থে এসব সামাজিক কীটদের মুখোশ উম্মোচন করা। এভাবে এদের প্রতারণাকর্মকে সমাজে অসম্ভব করে তোলা। একাজ শুধু পুলিশের নয়, প্রতিটি বিবেকমান মানুষেরই। বিলেতের কোন ইংলিশ পত্রিকায় এমন বিজ্ঞাপন ছাপতে গেলে পত্রিকা সম্পাদক তৎক্ষনাৎ পুলিশ ডেকে সে প্রতারকের জেলের ব্যবস্থা করতেন। সমাজের মানুষকে এসব প্রতারক থেকে বাঁচাতে যে কোন বিবেকবান ব্যক্তিতো এটিই করবে। অথচ কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বিলেতের অধিকাংশ বাংলা পত্রিকা ব্যবহৃত হচ্ছে এ প্রতারণার কাজে। নগদ অর্থপ্রাপ্তির লোভে নিজেদের বিবেককে তারা আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছেন। ফলে এরা বাংলাদেশী কমিউনিটির আর কি কল্যাণ করবে, বরং এদের কারণে দূর্বৃত্ত প্রতারকদের টার্গেটে পরিণত হচ্ছে কমিউনিটির সাধারণ মানুষ। অথচ ইংল্যান্ড একটি সোসোল সিকিউরিটির দেশ। এদেশে না খেয়ে মৃত্যুবরণ করা এমনকি কর্মহীন বেকারের পক্ষেও অসম্ভব। ফলে এসব প্রতারকদের দূবৃত্তকর্মে কেন মিডিয়া ব্যবহৃত হবে?

একটি সুস্থ্য ও সমৃদ্ধ পত্রিকার যতটা গুরুত্ব এদেশের নেটিভ ইংরেজদের কাছে তার চেয়েও অধিক গুরুত্ব পাওয়া উচিত ছিল প্রবাসী বাংলাদেশীদের কাছে। কারণ ইংরেজদের মানসিক পুষ্টির জোগান দিতে এদেশে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে। পরিবারিক নেট ওয়ার্ক, স্কুল-কলেজ ও নিজ নিজ কমিউনিটি নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করছে তাদের উপর। নিজ দেশ ও নিজ সংস্কৃতির মাঝে বসবাসের কারণে তারা শুধু পূর্ব-প্রজন্মের রেখে যাওয়া ঘরবাড়ী, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থসম্পদই পাচ্ছে না, উত্তরাধিকার রূপে পাচ্ছে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যও। এ দেশে তাদের রয়েছে মজবুত শিকড়। অথচ বিশ্বের অন্য প্রান্ত থেকে ছুটে আসার কারণে প্রবাসী বাংলাদেশীরা সর্বার্থেই শিকড়হীন তথা ভাসমান। ছিন্ন হয়েছে দেশের সাথে তাদের পরিবারিক ও সামাজিক বন্ধন। ফলে নতুন প্রজন্মকে সংস্কৃতিবান করার কাজে স্কুল-কলেজের বাইরেও পারিবারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গণ নিজ দেশে যে ভাবে

নীরবে কাজ করে সেটি এদেশে অনুপস্থিত। তাই প্রবাস জীবনে প্রতিকূল সাংস্কৃতিক স্রোতে ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা অধিক। এতে ভেসে যাবে তাদের আখেরাতের সকল চাওয়া পাওয়া। তাই এ ভেসে যাওয়া থেকে যারা বাঁচতে চায় তারাই গড়ে তোলে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান। আর এক্ষেত্রে স্কুল-কলেজ এবং মসজিদ-মাদ্রাসার পাশাপাশি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হলো পত্রিকা। চেতনাকে জীবন্ত ও সতেজ রাখার জন্য এটির বিকল্প নেই। তাই নিজ নিজ পত্রিকা রয়েছে এদেশে বসবাসরত ইহুদি, গ্রীক, ভারতীয়, পাকিস্তানি, আরব, তুর্কি, চীনা তথা প্রতিটি কমিউনিটির। অনেকের মিডিয়া অতিশয় শক্তিশালীও। দৈনিক পত্রিকা বের করছে পাকিস্তানী, তুর্কী ও ভারতীয়রা। সংখ্যায় বাংলাদেশীদের চেয়ে কম হয়েও একাধিক দৈনিক পত্রিকা বের করছে প্রবাসী আরবরা। এগুলির মান এদেশের ইংরেজী মিডিয়ার চেয়ে খুব একটা কম নয়। বিলেতের আরব মিডিয়াতেই শুধু নয়, এসব প্রবাসী আরব বুদ্ধিজীবীরা প্রচন্ড প্রভাব বিস্তার করে আছে আরর বিশ্বের মিডিয়াতেও। বলা যায় ইরাকে মার্কিন হামলার পর এরাই সমগ্র আরব বিশ্বকে জাগিয়ে তুলেছে। এমন কি পশ্চিমা বিশ্বে যুদ্ধবিরোধী যে প্রচন্ড মিছিল হয়েছে তারও পিছনে ছিল এসব বুদ্ধিজীবীরা। এদের কারণে আরবরে বুদ্ধিবৃত্তিক স্রোতটি বিপরীতমুখি। বাংলাদেশ থেকে লেখা আমদানি করে যেভাবে এদেশের বাংলা সাপ্তাহিকীগুলোর পৃষ্ঠা পূরণ করা হয়, আরবদের ক্ষেত্রে ঘটছে তার উল্টোটি। তারা সমৃদ্ধ করছে আরব বিশ্বের পত্রপত্রিকাগুলোকে এবং সে সাথে টিভি চ্যানেলগুলোকে। এদের কারণেই বেশ কয়েকটি আরব টিভি চ্যানেল ইতিমধ্যে বিশ্বব্যাপী প্রভাব ফেলেছে। সফলভাবে মোকাবেলা করছে ইঙ্গো-মার্কিন মিথ্যাচারকে। এবং প্রচন্ড প্রতিরোধের মুখে পড়েছে ইঙ্গো-মার্কিন ঔপনিবেশিক শক্তির ইরাক দখল। এটি সম্ভব হয়েছে এ কারণে যে এসব প্রবাসী আরব বুদ্ধিজীবীরা চিন্তাভাবনা কাজে বিলেতের নানা শহরে নানা প্রতিষ্ঠান ও এ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠা করেছে। এগুলীকে কেন্দ্র করে যেমন গঠনমূলক লেখালেখির কাজে লিপ্ত হয়েছে তেমনি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলেছে। তাদের কারণেই আরব বুদ্ধিজীবীদের লেখা সবচেয়ে মূল্যবান বইগুলো প্রকাশিত হচ্ছে আরববিশ্বের বাইরে। ফলে লেখকের পাশাপাশি তারা প্রচুর পাঠকও পেয়েছে। ইউএনডিপি'র রিপোর্টে আরব বুদ্ধিবৃত্তিক দৈন্যতাকে যেভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে সেটি হয়তো সহসা দূরও হতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশীদের শুধু লেখক সৃষ্টিতেই নয়, পাঠক সৃষ্টিতেও। তাই একাধিক আরবী দৈনিক পর্যাপ্ত পাঠক পেলেও কোন বাংলা দৈনিক তা পায় না। ফলে বিলেতে বাংলা দৈনিকের জন্মলাভ ও বেঁচে থাকাই দায়। কারণ, উন্নত মানের লেখক গড়ে না উঠলে পাঠকই বা গড়ে উঠবে কেমনে? দোকানে না বসালে যেমন ক্রেতা সৃষ্টি হয় না তেমনি লেখকের আগে পাঠকও সৃষ্টি হয় না। লেখকই তো পাঠককে টেনে আনে। তাই পত্রিকাকে পাঠকপ্রিয় করতে হলে সেটিকে লেখকপ্রিয়ও হতে হয়। এ সত্যটি বিলেতের বাংলা মিডিয়ার কর্তাব্যক্তিদের বুঝতে হবে। তাই পত্রিকাকে বাঁচাতে হলে শুধু বিজ্ঞাপন সংগ্রহে মনযোগী হলে চলবে না, উন্নত মানের লেখকও গড়ে তুলতে হবে। আর এভাবেই আসতে পারে বিলেতের বাংলাদেশীদের বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে সমৃদ্ধি। এবং তাতে বিলেতের বাংলাদেশী কমিউনিটির বিপদ যেমন কাটতে পারে তেমনি সমৃদ্ধ হতে পারে বাংলাদেশও।   লন্ডন ০৮/০৬/০৩